Downloaded from: justpaste.it/9ln2j

মসজিদে নববী ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা

আবু তাহের রহমানী

==========

মসজিদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পবিত্র স্থান। ইসলামী জীবনের প্রতিটি বিষয়ই মসজিদ ভিত্তিক। মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদাত, তেলাওয়াত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্যই নয়। ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রও মসজিদ। মসজিদ থেকেই পরিচালিত হবে সামাজিক বিচার-আচার ও ইসলামের রাজনৈতিক কর্মকৌশল। এমন কি 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' ও ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় কর্মকান্ড সূচিত হবে মসজিদকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায়, মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। মসজিদ ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বই অপূর্ণ। দ্বীন ও ইসলাম, তাওহীদ ও ঈমান চর্চার প্রধান ক্ষেত্র হলো মসজিদ। এক কথায়, ইবাদাত ও তেলাওয়াত, তা'লীম ও তারবিয়্যাত, রাজনীতি ও সমাজনীতি, বিচার ও সমরনীতি সব কিছুরই প্রাণকেন্দ্র এই মসজিদ।

তাই তো দেখা যায়, সুদীর্ঘ তের বছরের বাধা, প্রতিকূলতা, দুঃসহ শোষণ বঞ্চনায় নির্যাতিত নবী যখন মদীনার পথে হিজরত করলেন তখন মদীনার অনতিদূরে "কুবা" নামক স্থানে মাত্র চার দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো মসজিদ নির্মাণ। সে দিনের মসজিদ নামের সেই জীর্ণ কুটিরই আজকের ঐতিহাসিক 'মসজিদে কুবা' যা নবীর স্বদেশ থেকে হিজরত ও মাতৃভূমি বিচ্ছেদের বেদনা বিধূর স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মদীনায় পৌঁছে তাঁর কাজ হলো নবদীক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা, চরম জাহালত ও কুসংস্কারের তিমির অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজের সংস্কার ও সংশোধন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মুকাবিলা, উপরন্তু তাঁকে করতে হবে মদীনা কেন্দ্রিক নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। অথচ সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিলেন তিনি মসজিদ নির্মাণকে, যেখান থেকে পরিচালনা করবেন তিনি তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের মহান মিশন, প্রদান করবেন যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ঐশী সমাধান, দান করবেন মানুষকে দ্বীন ও শরীয়তের বাস্তব প্রশিক্ষণ। যেখানে বসে গড়ে তুলবেন তিনি নফস ও প্রবৃত্তির সব রকম মলিনতা থেকে চির পবিত্র এমন এক মুবারাক জামাআত ঈমান ও সত্যের চির অনির্বাণ মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়বেন যারা পৃথিবীর দিকে দিকে। কাঁচা ইটের গাঁথুনী ও খেজুর পাতার ছাউনি বিশিষ্ট সেই অতি সাধারণ ঘরই কাল পরিক্রমায় আজ পৃথিবীর এক অন্যতম ও সুবিশাল মসজিদে পরিণত। পবিত্র কাবা ও বায়তুল মাকদীসের পরেই যার শ্রেষ্ঠত্ব। লাখো কোটি আল্লাহ প্রেমিক ও আশেকে রাসূলের পদচারণায় মুখরিত থাকে যা দিবানিশি। যেখানের এক রাকাআত নামাজ অন্য মসজিদের হাজার রাকাআতের চেয়েও উত্তম।

মসজিদে নববী নির্মাণে দুই ইয়াতীম বালকের জমি নির্বাচন

মদীনার দুই ইয়াতীম বালক, সাহল ও সুহাইলের এক খন্ড জমিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেন । জায়গাটি আনসারী সাহাবীগণের খেজুর শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হতো । আল্লাহর অদৃশ্য নির্দেশে মহানবী সাঃ এর উষ্ট্রি এখানেই বসে গিয়েছিল । ইতিপূর্বে সাহাবী আসয়াদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) এখানে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতেন । তাই বলা যায়, মহানবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বেই কতিপয় পূণ্যবান সাহাবীর হাতে এখানে মসজিদের প্রাথমিক সূচনা হয়ে গিয়েছিল ।

উক্ত ইয়াতীম বালকদ্বয় বিনামূল্যে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেও মহানবী (সাঃ) তা গ্রহণ করলেন না । 'তাবাকাতে ইবনে সায়াদ' এর বর্ণনা মতে তিনি এর মূল্য দশ দিরহাম ধার্য করলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তা পরিশোধ করে দিলেন । অন্য এক বর্ণনানুযায়ী, এ যমীনের মূল্য বাবৎ হযরত আসয়াদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) উক্ত ইয়াতীমদ্বয়কে বনু বিয়াযাহ নামক স্থানে তাঁর একটি বাগান ছেড়ে দিয়েছিলেন । এখানে কিছু কবর ও খেজুর গাছ ছিল । আবু দাউদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিতঃ কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল ।

মসজিদ নির্মাণ

মসজিদের স্থান হতে কর্তিত খেজুর গাছ দ্বারা মসজিদের খুঁটি ও খেজুর পাতাগুলোকে ছাউনির কাজে লাগানো হলো । কাদা মাটির তৈরি ইট দিয়ে মসজিদের চার দেয়াল উঠানো হলো । সরে যমীনে পাথর ফেলে তিন হাত উঁচু করে তার উপর কাঁচা ইটের দেয়াল তোলা হলো । করে তার উপর কাঁচা ইটের দেয়াল তোলা হলো । এই মুবারক মসজিদ নির্মাণে মহানবী (সাঃ) নিজে একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় অংশ গ্রহন করেছিলেন । নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করে এনে তা দিয়ে দেয়াল খাড়া করেন । সাহাবীগণ আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা থাকতে আপনার এ কষ্ট করার কি প্রয়োজন? কিন্তু রহমতের নবী তাঁদের অনুরোধে কান না দিয়ে পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেলেন । কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে জানবায সাহাবীগণের সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও বলতেনঃ

“হে আল্লাহ্! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহমত করুন । "

হিজরতের পরেও ষোল সতের, মাস যাবৎ মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল । দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসের মধ্য ভাগে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এল । তাই মসজিদ নির্মাণের সময় কিবলা মদীনা থেকে উত্তর মুখি করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রাখা হয়েছিল । মসজিদের দরজা ছিল তিনটি । মসজিদের পিছনে উত্তর দিকে একটি, একটি ‘বাবে আতেকা পরবর্তী নাম বাবে রহমত এবং তৃতীয়টি হলো‘বাবে উসমান’ যা পরে জিবরাইল নাম ধারণ করেছিল । মহানবী (সাঃ) সাধারণত বাবে জিব্রাঈল দিয়েই মসজিদে প্রবেশ করতেন । বাবে রহমত ও বাবে জিবরাঈল ছিল যথাক্রমে মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে । বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এলে উত্তর দিকের দরজা বন্ধ করে দক্ষিণ দিকে একট দরজা খোলা হয় । কারণ পবিত্র কা’বা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ।

প্রথম নির্মাণের সময় মসজিদের দৈর্ঘ্য সত্তর হাত ও প্রস্থ ষাট হাত ছিল । সপ্তম হিজরীতে খায়বার অভিযান থেকে ফিরে এসে পুনরায় যখন মহানবী (সাঃ) মসজিদে নববী নির্মাণ করেন তখন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই একশত হাত করে রাখা হয় । মসজিদের পূর্ব দিকে উম্মাহাতুল মুমেনীন এর কামরা থাকার কারণে দ্বিতীয় বারের এ বর্ধিতকরণ মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হয়েছিল । দীর্ঘ ছয় সাত মাস যাবৎ মহানবী (সাঃ) ও তাঁর

সাহাবীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত এ মসজিদে কোন কারুকার্য ও জাঁকজমক ছিল না । মাটির ভিটি ও খেজুর গাছের ছাউনী থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই গোটা মসজিদ কর্দমাক্ত হয়ে যেত । অবশ্য কিছুদিন পর ভিটিতে পাথর কণা বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল ।

মহানবী (সাঃ)-এর হুজরা শরীফঃ

মসজিদ নির্মাণ সমাপ্তির পর মসজিদ সংলগ্ন পূর্বদিকে তিনি স্বীয় স্ত্রীগণের জন্য হুজরা তৈরী করলেন । তখন মহানবী (সাঃ)- এর স্ত্রী দু'জন ছিলেন । অর্থাৎ হযরত সাওদা বিনতে যুময়া ও হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) । এ কারণে তিনি মাত্র দুটি হুজরা তৈরী করেন । অন্যান্য হুজরাগুলো পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তৈরী হয় । উক্ত হুজরা দুটি কাঁচা ইট ও খেজুর পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল । বেড়া দেয়া হয়েছিল খেজুর পাতার চাটাই দ্বারা । প্রতিটি হুজরার পরিধি ছিল ছয়-সাত হাত প্রস্থ ও দশ হাত দৈর্ঘ্য । ঘরের ছাদ এত নিচু ছিল যে, দাঁড়িয়ে হাত উঠালে হাত ছাদে লেগে যেতো । কাঠের কোন দরজা না থাকায় পর্দার জন্য কল টানিয়ে দেয়া হতো । ঘর তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে হিজরতের সপ্তম মাসে তিনি আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে স্বীয় হুজরায় তাশরীফ আনেন । মহানবী(সাঃ) যেখানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন, সেটাই ছিল উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরা । আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেনঃ "নবীদের ওফাত যেখানে হয় দাফনও সেখানেই করতে হয় । " তাই তাকে উক্ত হুজরার এক পার্শ্বে সমাহিত করা হয় । কারণ এই পবিত্র হুজরায়ই তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম দশ জন, দশ জন করে প্রবেশ করে তার জানাযার নামাজ পড়েন । মসজিদে নববীর ডান দিকের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এ স্থানটিকে "মাকসুরায়ে নববিয়্যাহ" বলা হয় । রাসূলের ওফাতের পরেও আয়েশা (রাঃ) এ কামরারই অপর অংশে থাকতেন ।

মহানবী (সাঃ) এর পার্শ্বে হযরত উমর (রাঃ)-এর দাফনের পূর্ব পর্যন্ত তের বছর যাবৎ তার বিছানা ও রাসূল (সাঃ)-এর কবরের মাঝে তিনি কোন রকম পর্দা ছাড়া উক্ত কামরায় অবস্থান করতেন । কারণ উক্ত কামরায় চিরনিদ্রায় শায়িত একজন তার প্রিয় স্বামী আর অপরজন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা । ওমর (রাঃ)-এর দাফনের পর তিনি বললেনঃ এখন সেখানে পর্দা ছাড়া যেতে লজ্জা হয় ।

সুফফা ও আসহাবে সুফফা

মসজিদে নববীর দক্ষিণ পার্শ্বে মহানবী (সাঃ) তৈরী করলেন একটি বিরাটাকৃতির ছাউনী । আরবী ভাষায় যাকে 'সুফফা' বলা হয় । এটা ছিল নিরাশ্রয় সাহাবীগণের আশ্রয় স্থল । যাদের আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না, ছিল না তাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই কিংবা জীবিকা নির্বাহের কোন অবলম্বন । স্থানীয় ও বহিরাগত নির্বিশেষে সকলেই এখানে সমবেত হতেন দ্বীন ও শরীয়তের তালীম ও তারবিয়্যাত হাসিলের জন্য । ইলম পিপাসু সাহাবীগণ এই ছাউনীতে বসে নববী ইলম চর্চায় মশগুল থাকতেন । তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল চার শতাধিক । কখনও দশ, বিশ,পঞ্চাশ ষাট জনেও এসে দাঁড়াতো । হযরত বেলাল, সুহাইল, আম্মার ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ)প্রমুখ সাহাবীগণ এই আসহাবে সুফফারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । দ্বীনের জন্য তারা নিজেদের দিবা-রাত ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন ।

তাঁরা দ্বীন ও শরীয়াতের তালীম হাসিল করতেন, কুরআন শিখতেন আর রাতে ঐ ছাউনীতে পড়ে থাকতেন । তাদের মধ্যে কিছু সাহাবী ছিলেন দিবা-রাত কুরআনের তালীম ও চর্চাই ছিল যাদের একমাত্র কাজ । ইসলামের দাওয়াত বা কুরআনের তালীমের জন্য কোথায়ও লোক পাঠানোর প্রয়োজন হলে তাদেরকেই পাঠানো হতো । তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের পরে "বীরে মাউনা" নামক স্থানে দাওয়াতের জন্য প্রেরিত হয়ে

যে সত্তর জন হাফেজে কুরআন সাহাবী মুনাফিক চক্রের হাতে শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাঁরাও এই আসহাবে সুফফারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । এরা অধিক হারে রোজা রাখতেন । যে কোন যুদ্ধাভিযানে শরিক হতেন । কেউ বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করলে ছাউনী ছেড়ে চলে আসতেন । তাদের মধ্যে একদল দিনভর বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে অন্য ভাইদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন । দরবারে রিসালাতে কোথাও থেকে সদকার খাবার এলে, তা তিনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন ।

মিম্বরে নববী

প্রথম দিকে মসজিদে নববীতে কোন মিম্বর ছিল না । খুৎবার সময় মহানবী (সাঃ) স্বীয় মুসাল্লার নিকটেই স্থাপিত খেজুর গাছের একটা খণ্ডের উপর ভরকরে খুৎবা দিতেন । এক জুমায় মহানবী (সাঃ) উক্ত খেজুর গাছের খণ্ডের উপর ভর করে খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে তমীম দারী নামক জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি পেলে আমি আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দিতাম । যেন আপনি তাতে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে পারেন এবং শ্রোতারাও আপনাকে দেখতে পায় । সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মনপূত হলো । তিনি মিম্বর তৈরীর অনুমতি দিলেন । তখন হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এ কাজে পারদর্শী তার এক কৃতদাসকে দিয়ে তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করিয়ে দিলেন । মহানবী (সাঃ) প্রথম যেদিন উক্ত খেজুর গাছের খণ্ড ছেড়ে নবনির্মিত মিম্বরে উঠে খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন সেদিন উক্ত খেজুর গাছের খণ্ড,মহানবী (সাঃ) এর বিচ্ছেদ ব্যথায় এমন স্বশব্দ আওয়াজে কান্না ও বিলাপ ধ্বনি শুনা যাচ্ছিল, যেন চরম ক্ষুধা ও অস্থিরতায় কাতর কোন উষ্ট্রি গড়গড় করছে । নবী (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে স্বীয় মুবারক হাত তাতে রেখে সান্তনা দিলে, উক্ত আওয়াজ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায় । এজন্যই তাকে- 'উসতুয়ানায়ে হান্নানাহ'বলা হয় । উক্ত খণ্ডের পাশেই একটি বাক্স,ছিল । তাতে এক কপি কুরআন শরীফ সংরক্ষিত থাকতো । সাহাবায়ে কেরাম এর নিকটে বসে কুরআন শরীফ মুখস্ত করতেন এবং বাক্সে সংরক্ষিত কুরআন শরীফ থেকে লিপিবদ্ধ করে আর নিতেন ।

মসজিদে নববীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ পবিত্র কাবা শরীফ, যা নির্মাণ করেন আল্লাহর প্রিয় খলীল ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আঃ) । এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস । এর পরেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মসজিদ মদীনার এই মহা পবিত্র মসজিদ । মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেনঃ “আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ আম্বিয়া (আঃ) নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ । পবিত্র কাবাগৃহের পরে পৃথিবীতে এটাই একমাত্র মসজিদ, সাওয়াব লাভের আশায় যার উদ্দেশে সফর করা যায় । ”আরেক হাদীস থেকে জানা যায়, “পবিত্র কাবা, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে নববী, কেবল এ তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভের আশায় সফর করার অনুমতি রয়েছে । ”এটা সেই মহা পবিত্র মসজিদ যেখানে মহানবী (সাঃ) সুদীর্ঘ দশ বছর যাবৎ আল্লাহর ঐশী ইলমের দরস দিয়েছেন, স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদা আদায় করেছেন । সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি এখানেই সর্বাধিক সালাত আদায় করেছেন । এটা সেই সৌভাগ্যবান মসজিদ, যা স্বয়ং মহানবী (সাঃ) ও তার মুবারক জামায়াত সাহাবীগণের পবিত্র হাতে তৈরী হয়েছিল । এটাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যতম মসজিদ ।

ইসলাম এক পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা । পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান যেমন তাতে রয়েছে,পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানও তাতে খুঁজে পাওয়া যায় । জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ইসলামের এক আবশ্যকীয় দাবী । ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম ও রাজনীতি এ দুয়ের সমন্বিত রূপই হলো ইসলাম । বস্তুতঃ পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের পার্থক্য এখানেই । কারণ ইসলামে জীবন ধারার সব কিছুতে

আল্লাহর হুকুম ও বিধান বিধৃত থাকায় মুসলমানের প্রতিটা কাজ ইবাদত রূপে গণ্য হয় । এজন্যই ইসলামের স্বর্ণযুগে কখনও ধর্মকে রাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হতো না, তখন যে কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারের রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বের সাথে সাথে নামাযের ইমামাত ও খুৎবা, প্রদানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল । সুতরাং বলা যায় ধর্ম ও রাজনীতি উভয়েরই প্রাণকেন্দ্র হলো মসজিদ ।

ইকামাতে সালাতঃ

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছেঃ “আমি যখন তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করি, তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে । "

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা জাতীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করবে, তাদের প্রতি আল্লার অলঙ্ঘনীয় বিধান হলোঃ তারা যেন সামাজিকভাবে সালাত কায়েম করে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও অন্যায় প্রতিরোধে সর্বাত্মক ভুমিকা গ্রহণ করে । সর্বোপরি আল্লাহর যমিনে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর আইন ও নববী আদর্শ । তাওহীদ ও ইসলামের ভিত্তিতে এ ধরণের রাজনীতির বাস্তব অনুশীলনের জন্য মসজিদের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম । সালাত ইসলামের এক অন্যতম স্তম্ভ । ঈমানের পরেই সালাতের গুরুত্ব । আল কুরআনের নির্দেশ 'তোমারা রুকু কারীদের সাথে রুকু কর” । এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সালাত সম্মিলিতভাবে মসজিদেই আদায় করতে হয় । মহানবী (সাঃ)-ও জামায়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ।

দেশের জাতীয় ও কেন্দ্রীয় মসজিদের এ জামায়াতের ইমাম হবে স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান, অন্যান্য মসজিদে তার প্রতিনিধিরা । মহানবী (সাঃ) ও খেলাফতে রাশেদার যুগ এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসনামলে এ নীতির অনুসরণ করা হতো বিশেষ গুরুত্বের সাথে । বস্তুতঃ নামায এমন এক ঐশী বিধান, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সাম্য, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও গভীর সম্পর্ক । একই কাতারে দাঁড়ানোর ফলে অবসান ঘটে আমীর-ফকীর, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত ও ছোট-বড়োর এবং বিরাজ করে মানুষের মাঝে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির সুপ্রভাত । এজন্যই প্রতিটি মুসলমানকে দৈনিক একবার নয় পাঁচবার মসজিদে সমবেত হতে হয় । সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ইবাদত ও ইবাদতকে পূর্ণতা দানের জন্য মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম । মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও মসজিদের সংরক্ষণ মুসলিম উম্মাহর ঈমানী দায়িত্ব ।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মসজিদের অবদানঃ

মসজিদ শুধু মাত্র সালাত ও ইবাদতের জন্যই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষারও প্রাণকেন্দ্র মসজিদ । মসজিদে নববীতে মানুষের পরকালীন মুক্তির বাণী যেমন শিক্ষা দেয়া হতো অনুরূপ পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েরও শিক্ষা দান করা হতো । জুমার নামাজের পূর্বে খুতবার বিধান মূলতঃ এজন্যই । মুসলমানদের বিগত সপ্তাহের সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবি সমস্যা তুলে ধরে তার শরীয়ত নির্দেশিত সমাধান প্রদানই খুৎবার মূল উদ্দেশ্য । মহা নবী (সাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখনও কঠিন দুর্বলতা নিয়ে অন্যের উপর ভর করে মসজিদে নববীতে এসে খুৎবা দান করেন ।

এছাড়াও মসজিদে নববীতে দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞান দান ও চর্চার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা ছিল । বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত তালিবে ইলমদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও মসজিদে নববীতেই হতো । মসজিদে নববীতে কখনও কখনও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হতো । হযরত হাসান ইবনে যাবির (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর শানে

কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং অন্যদের কবিতার জবাব দিতেন। খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজ (রাঃ) কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জন্য মসজিদে নববীতেই তাঁবু খাটানো হলো।

গনীমতের মাল, যাকাত এখান থেকেই বিলি বন্টন করা হতো। একবার বাহরাইন থেকে গণীমতের কিছু মাল এলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা মসজিদে রাখার নির্দেশ দেন। নামাজের পর তিনি তা মসজিদ থেকেই বন্টন করে দিলেন। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কোন প্রতিনিধি দলকে মহানবী (সাঃ) এই মসজিদে নববীতেই সাক্ষাত দান করতেন। নাজরান থেকে আগত তার সাক্ষাৎ প্রার্থী দলের বসার ব্যবস্থা তিনি মসজিদে নববীতেই করেছিলেন। সাকী গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথেও তার আলোচনা মসজিদেই হয়েছিল। মসজিদে নববীকে কখনও কখনও জেলখানারূপে ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ সুমামা ইবনে আসালকে গ্রেফতার করে আনা হলে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হলো। মহানবী (সাঃ) মসজিদে তাশরীফ এনে সুমামাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন সে নিকটবর্তী একটি বাগানে গিয়ে গোসল করে এসে মহানবী (সাঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন।

মসজিদের রাজনৈতিক গুরুত্বঃ

ধর্ম ও রাজনীতি এ দুয়ের সমন্বিত রূপই হলো ইসলাম। রাজনীতি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কল্পনা করা যায় না। মহানবী (সাঃ)-এর যুগ এবং পরবর্তী খেলাফতে রাশেদা ও তাবেয়ীগণের শাসনামলেও মসজিদ শুধু মাত্র ইবাদত খানা রূপেই ব্যবহৃত হতো না বরং তা ছিল মুসলমানদের জাতীয় কাউন্সিল ভবন, সকল প্রকার সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান মসজিদ থেকেই হতো। জিহাদের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ ও শত্রু বাহিনীর মুকাবিলার যাবতীয় কৌশল নিরুপন করা হতো মসজিদ থেকেই। খলিফাতুল মুসলেমীনকেই পালন করতে হতো জাতীয় মসজিদের খতীবের দায়িত্ব।

খেলাফতের দায়িত্ব লাভের পর তাঁকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনসম্মুখে খুৎবা দিতে হতো। রাসূলের ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় দিন মসজিদে নববীতে তাশরিফ এনে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর মিম্বরে উঠে সাহাবায়ে কেরামের সামনে খুৎবা প্রদান করে বললেন, "বন্ধুগণ! আমি আপনাদের শাসক নির্বাচিত হয়েছি বটে, কিন্তু আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম নই। 'অনুরূপ হযরত উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) মসজিদে নববীতেই খলিফাতুল মুসলেমীনরূপে জনগণের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে খলীফা উমর (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য যে পরামর্শ সভা করেছিলেন তাও মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) খলীফা রূপে মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) খলীফা রূপে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দানরত অবস্থায়ই তার প্রতি এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, পাথরের আঘাতে তিনি বেহুঁশ হয়ে মিম্বর হতে পড়ে গেলেন। উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত লাভের তিনদিন পর আলী (রাঃ) মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে মুহাজির ও আনসারদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বিশেষ খুৎবা প্রদান করতেন। তখন মসজিদই ছিল খলীফা ও সাধারণ জনগণের মিলন ক্ষেত্র। রাষ্ট্রের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতো মসজিদেরই ভিতরে। খলীফা উমর (রাঃ)-এর সময়ে তো মসজিদে নববীতে মুহাজিরদের একটি নিয়মিত মজলিস বসতো। সেখানে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মসজিদে নববী ছিল মুসলমানদেন প্রধান বিচারালয়। পারস্পরিক যাবতীয় ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা সেখানে হতো। প্রয়োজনে অপরাধীর প্রতি শাস্তি আরোপ করা হতো।

মোটকথা, মসজিদে নববী শুধুমাত্র কোন গতানুগতিক ইবাদাত খানা ছিল না। বরং তা ছিল একাধারে মুসলমানদের জাতীয় পার্লামেন্ট, ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র, ইসলামী আইন প্রয়োগের সর্বোচ্চ আদালত এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর জাতীয় সদর দফতর ।

তথ্যসূত্রঃ
১। জাওয়ামেউস সিয়ার
২। সহীহ আল-বুখারী ।
৩। তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সায়াদ ।
৪। নুযহাতুন্নাজেরীন ফি মাসজিদি সাইয়্যেদুল আউয়্যালীন ওয়াল আখেরীন ।
৫। সুনানে আবু দাউদ।
৬। সুনানে ইবনে মাজাহ।
৭। উমরাতুল আখবার ফি মাদীনাতিল মুখতার।
৮। তাহযীব ও তামাদ্দুনে ইসলামী
৯। রিসালায়ে আসহাবে সুফফা { ইবনে তাইমিয়াহ)
১০। সিরাতুন্নবী (শিবলী নোমানী)।
১১। সহীহ আল-মুসলিম ।
১২। সিরাতুন্নবী (ইবনে হিশাম)
১৩। তারীখে ইসলাম।
১৪। ফুতুহুল বুলদান।